WBMDFC

KNOWLEDGE SERIES IX

বেণীমাধব বড়ুয়া

বৌদ্ধ সমাজের বিস্মৃত দিক্‌পাল

মুখবন্ধ

সমাজ ইতিহাসের ধারায় দেখা গেছে কিছু কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়-এর দ্বারা অনন্য হয়ে ওঠেন। সততা, মুক্ত চিন্তা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাদের ব্যক্তিত্ব নিজ প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ।

'পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম' বিগত দিনের বাংলার কয়েকজন মনীষীর জীবন ও কর্মসাধনার বিবরণ একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র ও পুস্তিকার (WBMDFC-Knowledge Series) মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। এদের কর্মসাধনা ও জীবনব্রত পাঠে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই অনুপ্রাণিত হবে বলে আমাদের ধারণা। এই মহৎপ্রাণ মানুষদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে।

ডঃ পি. বি. সালিম, আই.এ.এস
চেয়ারম্যান
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা গেছে কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং ত্যাগ দ্বারা হয়ে ওঠেন কালজয়ী। মুক্ত চিন্তা, ত্যাগ ও মানবজাতির সেবার মাধ্যমে তাদের কাজ চিন্তাভাবনা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম এরূপ মনীষীগণের জীবন ও কর্মসাধনা এ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। WBMDFC- Knowledge Series বিভাগের প্রথম পর্যায়ে চারজন মনীষী হাজি মহম্মদ মহসিন, ডঃ হাসান সোহরাওয়ার্দী, তিতুমির ও ভগিনী নিবেদিতার কর্মসাধনা অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

WBMDFC- Knowledge Series-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো কতিপয় মনীষী যেমন বেগম রোকেয়া, বেনীমাধব বড়ুয়া, স্যার আজিজুল হক এবং লালন শাহ-এর কর্মসাধনা অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা আশা রাখি, বেনীমাধব বড়ুয়া সম্পর্কে এই পুস্তিকাটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপকৃত করবে।

মৃগাঙ্ক বিশ্বাস
ওএসডি এবং এক্স অফিসিও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

বেণীমাধব বড়ুয়া

বৌদ্ধ সমাজের বিস্মৃত দিক্‌পাল

প্রকাশ কাল
মিলন উৎসব
ফেব্রুয়ারি, ২০২২
পরিমার্জিত সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০২৩
জুন ২০২৩

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক দপ্তরের অধীনস্থ একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা)

বরেণ্য বেণীমাধব

(১৮৮৮ - ১৯৪৮)

প্রস্তাবনা

বৌদ্ধ সমাজের বিস্মৃত দিক্‌পাল পণ্ডিতপ্রবর, ভারত তত্ত্ববিদ, এশিয়ার প্রথম ডি.লিট উপাধিতে অলংকৃত ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্বেও ব্যাপক অজ্ঞাত ছিল।

শতাব্দীপ্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই পণ্ডিত ব্যক্তিকে নানাভাবে সম্মানিত করেছেন বটে, তথাপি তাঁকে কেন্দ্র করে কোনওরূপ গবেষণামূলক উদ্যোগ অদ্যাবধি পরিলক্ষিত হয়নি। তাঁর একটি আবক্ষমূর্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ও একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি বউবাজার নালন্দা পার্কে ইউনাইটেড বুদ্ধিস্ট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগম অতঃপর সংখ্যালঘু শ্রেণির উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্বকে সর্বসাধারণের নিমিত্ত প্রচারে ব্যাপৃত হইয়াছে। এই আন্তরিক উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অতীব প্রশংসনীয়। সাধুবাদ যোগ্যও বটে। পুস্তিকাটিতে শৈশবের পাঠশালা, উচ্চশিক্ষার নিমিত্তার্থে কলকাতায় গমনসহ সুদূর বিলেত যাত্রা ও সর্বশেষে এশিয়ার প্রথম ডি.লিট

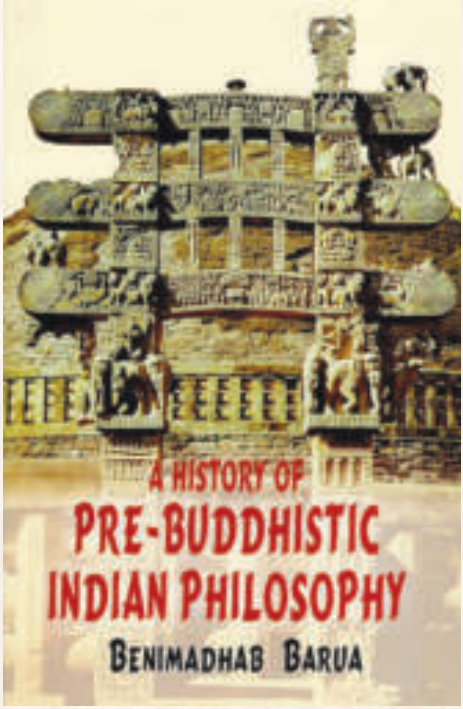

উপাধিপ্রাপ্তি, প্রতিকূল পরিস্থিতি, আর্থিক অপ্রতুলতার প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অসামান্য সহযোগিতায় সফল হওয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দীপক কুমার বড়ুয়া রচিত অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া: নন্দিত জীবন ও গবেষণাকর্ম, ড. মণিকুন্তলা হালদার (দে) ও ইউনাইটেড বৌদ্ধ দর্পণ পত্রিকার বেণীমাধব সংখ্যা (ভলিউম ১১, ডিসেম্বর ৫)-র প্রতি ঋণ অবশ্য স্বীকার্য। সর্বসাধারণ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা থেকে জ্ঞানারোহণ করে সব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন বলে অভিমত ব্যক্ত করছি। সফলতার শীর্ষদেশে সকল সংখ্যালঘু শ্রেণির যুবক-যুবতীরা তাঁর তুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলেই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হবে। সকলের শুভ উদ্যোগ, শুভ চেতনায় এক সমৃদ্ধ সংখ্যালঘুরা ঐক্যের বাতাবরণ রচনা করলে সব সমাজ, রাজ্য ও দেশের সর্বমঙ্গল সাধিত হতে পারবে।

১৯১৪ সালে ভারত সরকার তাঁর বৃত্তি মঞ্জুর করেন। বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ১৯১৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বিলেতের বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ছাব্বিশ বছরে গবেষক ছাত্ররূপে যাত্রা করেন।

শৈশবের পাঠশালায়

১৮৮৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত মহামুনি পাহাড়তলি গ্রামে এক মধ্যবিত্ত বাঙালি বৌদ্ধ পরিবারে বেণীমাধব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কবিরাজ রাজচন্দ্র তালুকদার এবং মাতা ছিলেন ধনেশ্বরী মুৎসুদ্দী তালুকদার। তাঁদের ছয় কন্যা এবং পাঁচ পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ সন্তান। শৈশব থেকেই তাঁর পড়াশোনায় আগ্রহ দেখে ১৯০২ সালে তাঁকে মহামুনি

পাহাড়তলি গ্রামের মাইনর মিডল ইংলিশ (এম.ই)-এ ভর্তি করানো হয় এবং পরবর্তীতে সেই স্কুল থেকেই তিনি মিডল ইংলিশ (এম.ই) পরীক্ষায় পাশ করেন। এই সময় তিনি পারিবারিক পদবি 'তালুকদার' পরিবর্তন করে বৌদ্ধ জাতিগত পদবি 'বড়ুয়া' লিখতে শুরু করেন। অতঃপর চট্টগ্রামের চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে 'এন্ট্রান্স' ও চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এফ.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় তিনি বৌদ্ধভিক্ষু অগ্রমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবিরের কাছে পালিভাষা ও সাহিত্যের প্রারম্ভিক পাঠ নেন। স্বীয় মেধাজনিত কারণে পড়াশোনার সময়ে স্কুল ও কলেজে বিনা বেতনে পড়াশোনা চালানোর সুযোগ লাভ করেন তিনি। এ ছাড়াও সরকারের কাছ থেকেও তিনি সেই সময় বিশেষ স্কলারশিপ বা বৃত্তি লাভ করেন। আর্থিক অপ্রতুলতা তাই বেণীমাধবের শৈশবের দিনসমূহের পড়াশোনায় কোনও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারেনি।

পরবর্তী সময়ে সকলের ঋণ স্বীকার করে বলেছিলেন, 'আমি সেই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন যারা গরিব ঘরে জন্মগ্রহণ করেও জীবনযাত্রায় মহাসংগ্রামে সফল হয়েছি আত্মীয়স্বজন, দেশবাসীর সহায়তা ও উৎসাহ পেয়েছিলাম বলে। আমার স্কুলজীবনের প্রায় শুরু থেকেই ইংরেজ সরকার উদারভাবে বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ এবং বিশেষ ছাত্রবৃত্তি বা স্কলারশিপ প্রদান করে আমাকে সাহায্য করেছেন, যার দ্বারা আমি ভারতবর্ষে ও লন্ডনে আমার অধ্যয়ন

ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিমূর্তি। যদিও তাঁর জন্ম গোঁড়া বাঙালি বৌদ্ধ পরিবারে তথাপি তিনি সর্বপ্রকাশ ধর্মীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে ছিলেন। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব প্রথম প্রতিফলিত হয় তাঁর গবেষণাপত্রে ও গবেষণাকর্মে।

চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। বলা বাহুল্য, সরকারের এরকম উদার সহায়তা না পেয়ে আমার শিক্ষার লিপ্সা নষ্ট হয়ে যেত।' ('এ হিস্ট্রি অফ প্রি-বুদ্ধিস্টিক ইন্ডিয়ান ফিলোজফি' প্রিফেস, পৃ. ৯)।

উচ্চশিক্ষা কলকাতায়

১৯০৮ সালে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি কলকাতায় আসেন। চট্টগ্রামে থাকার সময় তাঁর পিতৃব্য ধনঞ্জয় তালুকদার বেণীমাধবের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে নিজগৃহে নিয়ে এসে পড়াশোনার খরচ বহন করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর এফ.এ পরীক্ষা শেষ করার আগেই তাঁর পিতৃব্য পরলোক গমন করলে তিনি অকূলপাথারে পড়ে যান। কিন্তু তাঁর পিতা বিন্দুমাত্র না দমে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র কানাইলালকে ১৯০৯ সালে রেঙ্গুনে পাঠান। সেখানে কানাইলাল 'সাঙ্গুভেলী টী কোম্পানি'তে চাকরি করে দাদা বেণীমাধবের উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে থাকেন। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি পালি বিষয়ে অনার্স নিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। এই সময় ইংরেজি অনার্সের ছাত্র শ্রী কুমার মুখোপাধ্যায় (ইংরেজি অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ), শ্রী রামতনু লাহিড়ী (অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রী সুকুমার দত্ত (অধ্যক্ষ, দিল্লি রামজস কলেজ) ও বিশিষ্ট নাট্যকার শ্রী শিশির কুমার ভাদুড়ির

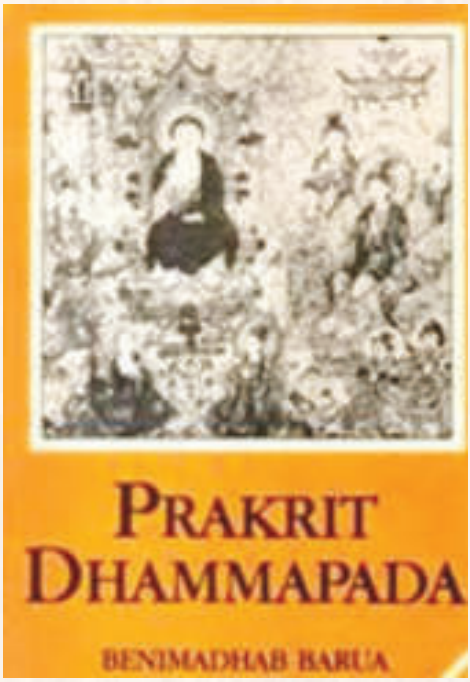

সান্নিধ্য লাভ করেন। সেই সময় স্কটিশে পালিভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা না থাকায় বিশেষ অনুমতি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে পালি বিষয়ে ক্লাস করতেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে পালি ভাষাবিদ শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে। পরে বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯১১ সালে পালি বিষয়ে সাম্মানিক বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় তিনি সহপাঠীরূপে পান কবিশেখর কালিদাস রায়কে। ১৯১৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালি বিষয় নিয়ে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে 'স্বর্ণপদক' লাভ করেন। ইতিমধ্যেই তিনি সিটি কলেজ (মেইন) থেকে প্লিডারশিপ পাঠও সমাপন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে পড়াশোনা করেন ও আইনের একটি পরীক্ষায়ও সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তিনিই প্রথম, যিনি এম.এ পরীক্ষায় ফল প্রকাশের আগেই আংশিক সময়ের পালি অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বেণীমাধব বড়ুয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন ও শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি ও কলকাতার বাসভবন ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

বিলেত যাত্রা

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞানভিত্তিক উচ্চতর গবেষণার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার

কর্তৃক প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় বিশেষ বৃত্তিলাভ করে বেণীমাধব লন্ডন তথা বিলেত যাত্রা করেন। তাঁর এই যাত্রায় চিটাগাং বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশনও তাঁর বৃত্তি বিষয়ে আবেদনে শামিল হন। ১৯১৪ সালে ভারত সরকার তাঁর বৃত্তি মঞ্জুর করেন। বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ১৯১৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বিলেতের বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ছাব্বিশ বছরে গবেষক ছাত্ররূপে যাত্রা করেন। তাঁর বৃত্তি প্রাপ্তি উপলক্ষে 'জগজ্জ্যোতি' পত্রিকায় প্রকাশিত বিবৃতিতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর, লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর, শিক্ষা সচিব বাটলার, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও বঙ্গীয় বৌদ্ধসভার সভাপতিকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রদ্ধেয় কৃপাশরণ মহাস্থবির বিবিধ কারণে বেণীমাধবকে অশেষ স্নেহ করতেন এবং তাই তিনি তাঁকে বিলেতে শিক্ষার্থীরূপে পাঠানো বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল, চট্টলের সুকৃতি সন্তান বাংলা তথা ভারত তথা আপামর বৌদ্ধ সমাজের গর্ব ও আদরণীয় হতে পারেন। বিলেত হতে ডি.লিট প্রাপ্তির পর পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, উনাইনপুরা গ্রাম, রেঙ্গুনের ধর্মদূত বিহার, চট্টগ্রাম, সিলোন সহ বিবিধ বৌদ্ধ বিহারেও তিনি সংবর্ধিত হন।

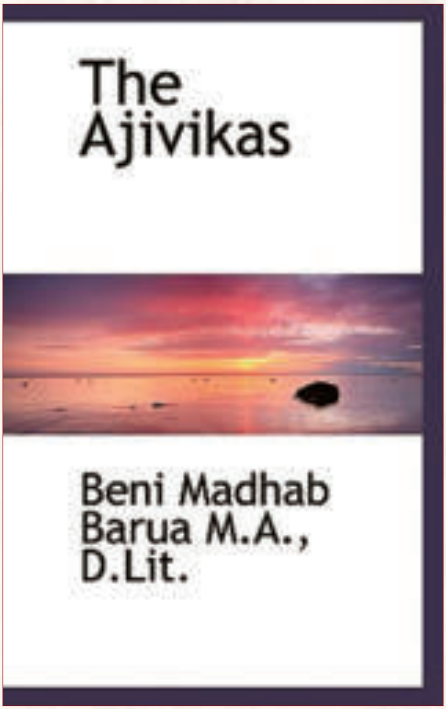

এশিয়ার প্রথম ডি.লিট উপাধি

অসাধারণ পরিশ্রম ও মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯১৭ সালের ১৮ জুলাই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদগ্ধ পণ্ডিতবর্গ ও অধ্যাপকবৃন্দ তাঁর অনন্য গবেষণার জন্য উচ্চতম গবেষণার উপাধি ডি.লিট প্রদান করেন। এশিয়াবাসীর মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম ডিগ্রি-প্রাপক। লন্ডনে তিনি এই সময় প্রথিতযশা অধ্যাপক পালিভাষা ও বৌদ্ধতত্ত্ববিদ দার্শনিক ডয়েস হিকস, মিস্টার ও মিসেস রিস্ ডেভিড্স, এল টি হবহাউস, এফ ডব্লিউ টমাস, এল ডি বারনেট ও মাবেল বোডের মতো ব্যক্তিত্বদের সাহচার্যে এসে পালিভাষা, বৌদ্ধশাস্ত্র এবং ভারতীয় দর্শনের পাঠ গ্রহণ করেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ডউস হিক্স-এর কাছে তিনি গ্রিক দর্শন ও আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পান। ড. বড়ুয়ার গবেষণার বিষয় ছিল Indian Philosophy: Its origin and Growth from the Vedas to the Buddha অর্থাৎ 'ভারতীয় দর্শন: তার উৎপত্তি এবং বৈদিক যুগ হতে বুদ্ধের সময় পর্যন্ত ক্রমবিকাশ'। উল্লেখ্য, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গবেষণাকর্ম কেবল পালিভাষা ও সাহিত্য এবং বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। কারণ তিনি সম্যক অনুধাবন করেন যে, বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ আহরণে বুদ্ধ পরবর্তী দর্শনও একান্ত আবশ্যক। তাই প্রবাসে

নিষ্ঠা সহযোগে সে বিষয়ে তিন বছর অক্লান্ত অধ্যয়ন শেষে তাঁর গবেষণাপত্র প্রস্তুত করেন। বলাই বাহুল্য, তাঁর এই গবেষণালব্ধ বিষয়বস্তু পণ্ডিতমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত ও উচ্চ প্রশংসিত হয়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সবিশেষ উদ্যোগে ১৯২১ সালে 'আ হিস্ট্রি অফ প্রি-বৌদ্ধিস্টিক ইন্ডিয়ান ফিলোজফি' নামে তাঁর গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়। আক্ষরিক অর্থে তিনি ছিলেন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস রচনার অন্যতম পথিকৃৎ।

ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি

ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিমূর্তি। যদিও তাঁর জন্ম গোঁড়া বাঙালি বৌদ্ধ পরিবারে তথাপি তিনি সর্বপ্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে ছিলেন। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব প্রথম প্রতিফলিত হয় তাঁর গবেষণাপত্রে ও গবেষণাকর্মে। মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের কিছু পূর্বে ভারতবর্ষে আজীবক নামে একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। জৈন বা বৌদ্ধ কোনও ধর্মগ্রন্থেই এই ধর্ম সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোনও সুমন্তব্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে আজীবক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক 'মকখলি গোসাল' এই সকল গ্রন্থে নিন্দিত ছিলেন। কিন্তু সর্বপ্রথম অধ্যাপক বেণীমাধবই প্রাক্-বৌদ্ধ ও দর্শন বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এই ধর্ম সম্প্রদায় সম্বন্ধে তথ্য সমৃদ্ধ স্বীয় অভিমত প্রকাশ করে জানান যে, প্রবর্তক মকখলি গোসাল অহিংসার পূজারি ছিলেন। তাঁর নৈতিক মতবাদ মহাবীর ও

অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া ইংরেজি ও বাংলাভাষায় বহু গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করেছেন। এই সকল গ্রন্থে তাঁর বিস্মৃত ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বিবৃত রয়েছে।

বুদ্ধের কল্যাণকর হিতকারী প্রভাব বিস্তারে সহায়ক ছিল। অধ্যাপক বেণীমাধবের এই পক্ষপাতশূন্য ও সংস্কারমুক্ত চিত্ত তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ অভিপ্রায়েরই পরিচায়ক। বৌদ্ধ ধর্মের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিলেন না তিনি। তিনি সম্যক উপলব্ধি করেন যে, তথাগত বুদ্ধের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁর পূর্ব ও পরবর্তী মতবাদ, দর্শন, সাধনা ও আচার পদ্ধতি বিষয়ক জ্ঞানারোহণ আবশ্যক। সেজন্যই তিনি কোনও ধর্মমত, মনীষী ও তাঁর নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ থাকেননি। ব্যক্তিজীবনেও তিনি ধর্মনিরপেক্ষ, পক্ষপাতহীন ও উদারমনস্ক ছিলেন। তাঁরই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর দৈনন্দিন জীবনে (দৈনিক স্টেটসম্যান, কলকাতা, ২১ নভেম্বর, ২০১০, আশীষ গঙ্গোপাধ্যায়— ভারত বিদ্যাচর্চায় বাঙালি বেণীমাধব বড়ুয়া ১৮৮৮-১৯৪৮)। কথিত আছে, ড. বড়ুয়া তাঁর ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তির ফর্মে লিখতে বলেন পূর্ব পুরুষদের ধর্ম হচ্ছে 'বৌদ্ধধর্ম'। অর্থাৎ নিজে কোনও বিশেষ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মাতার পরলোক যাত্রার অব্যবহিত পরেই তিনি মসজিদ, চার্চ, মন্দির বিহার প্রভৃতিতে ধর্ম-নির্বিশেষে পরলোকে মাতার শান্তি কামনায় প্রভূত অর্থদান করেছিলেন। শোনা যায়, তাঁর প্রথমা কন্যার (শ্রীমতী কনকচাঁপা) বিবাহ অনুষ্ঠানে তিনি একইসঙ্গে পাদ্রি, মৌলভি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বৌদ্ধ ভিক্ষু সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তির এমন জ্বলন্ত উদাহরণের সাক্ষী ছিলেন পণ্ডিতপ্রবর ড. বেণীমাধব বড়ুয়া।

স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়ার অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন ও শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি ও কলকাতার বাসভবনে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। উল্লেখযোগ্য যে, চট্টগ্রামেও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ব্রিটিশ সরকারকে ভারতের সীমানা থেকে উৎখাত করতে সশস্ত্র সংগ্রামে রত ছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ির পশ্চাতে একটি ছোট কুঠুরিতে

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিত্য শলাপরামর্শ হত। তাঁরা সকলেই বেণীমাধব বড়ুয়ার সহযোগিতায় গ্রামের বাড়িতে নিয়মিত আনাগোনা করতেন। এমনকী নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে থেকেও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অস্ত্র সংগ্রহের জন্য অর্থ সাহায্য করতেন। বস্তুত, এভাবেই তিনি চট্টগ্রামের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গ্রামে নিজের বাড়িতে আশ্রয় ও অর্থ দিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনায় সহায়তা করতেন। তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কলকাতা কিংবা শহরতলি অঞ্চলে ভাড়ায় বসবাস করতেন। সেই বসবাসের স্থান সাত-আট কক্ষবিশিষ্ট বৃহৎ বাড়িতে পরিণত হত। কারণ সেই ভাড়াবাড়ি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠত। অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া তাঁর স্বদেশ প্রীতির নির্দশন এভাবেই প্রায় নিঃশব্দে করে গিয়েছেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁর চরম বিদ্বেষ প্রকাশ করে স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা বিপ্লবীদের প্রতি অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও নিঃশর্ত সমর্থন জুগিয়েছেন বারংবার।

সাহিত্য অবদান

অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া ইংরেজি ও বাংলাভাষায় বহু গ্রন্থ ও

নিবন্ধ রচনা করেছেন। এই সকল গ্রন্থে তাঁর বিস্মৃত ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বিবৃত রয়েছে। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: (১) লোকনীতি, (২) মণিরত্নমালা, (৩) গৃহীবিনয়, (৪) মহামতিপট্‌ধান-সুওন্ত, (৫) A Prolegomena to a History of Buddhist Philosophy, (৬) The Ajivikas, (৭) A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy, (৮) Prakrit Dhammapada: A Critical Edition with Translation and Notes (৯) বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি, (১০) Barhut Inscription: A Critical Edition with Translation and Notes, (১১) Ashoka Edicts in New Light, (১২) The Religion of Ashoka, (১৩) Old Bramhi Inscription in the Udayagiri and Khandagiri Caves, (১৪) Gaya and Buddha Gaya, Early History of the Holy Land, Vol-1, Book-1, (১৫) Gaya and Buddha Gaya! Old Sharines at Buddhagaya. Vol-II, Books II-V, (১৬) Bharat 3, Vols: Vol I; Stone as story Teller. Vol II Jataka Scenes. Vol III, Art and Illustrations, (১৭) বৌদ্ধ কোষ তথা বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ ইত্যাদি। এ ছাড়া 'সিলোন লেকচারস' নামক তার অনুপম বক্তৃতা গ্রন্থাকারে

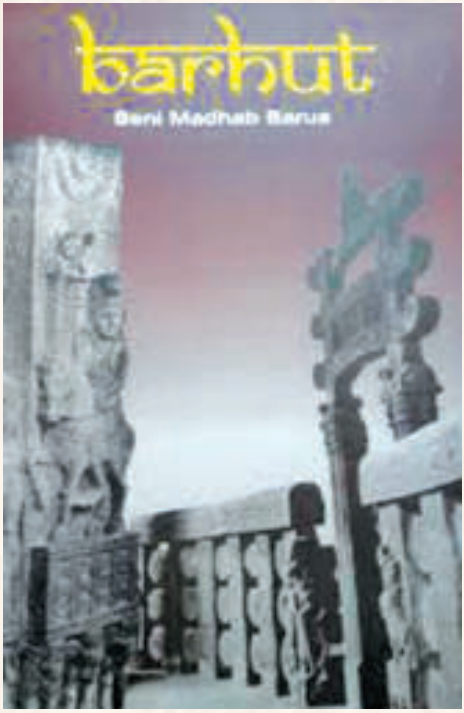

প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Hundred Years Of The University Of Calcutta (Calcutta 1957) গ্রন্থে তাঁর অপর তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা এখন প্রায় দুর্লভ। তিনটি গ্রন্থই ইংরেজিতে অনূদিত। এগুলি হল— (১) Chakma Taras from Chittagong Hill Tracts (২) Manuscript of the Drama-Samvccaya and the Karandevyuha ও (৩) Burmeese Manuscripts of Later Pali Works. উপরোক্ত গ্রন্থব্যতীত তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে প্রায় তিন শতাধিক নিবন্ধ ও রচনাদি বিভিন্ন মহাসম্মেলন ও পত্রপত্রিকায় লিখেছিলেন।

সহধর্মিণীর আত্মত্যাগ

পিতার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে ছাত্রাবস্থাতেই ১৯০৮ সালে তিনি নিজগ্রামের শ্রী দয়াধন বড়ুয়া এবং উমাবতী বড়ুয়ার নয় বছর বয়স্কা কন্যা পঙ্কজাসুন্দরীর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। সুদীর্ঘ সাংসারিক জীবনে তিনি তার সহধর্মিণীর উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁর স্ত্রী অসীম নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে সকল সাংসারিক সমস্যার সমাধান হাসিমুখে করে নিতেন। সংসারের দায়ভাগ নিজ কাঁধে নিয়ে বেণীমাধবকে তাঁর গবেষণাকাজে পরোক্ষ সহায়তা করতেন। স্বীয় হস্তে সুচারুরূপে তাঁর স্ত্রী স্বামীকে বিন্দুমাত্র ব্যতিব্যস্ত না করেই দিনের পর দিন সংসারধর্ম পালন করে গিয়েছেন।

ছাত্রাবস্থায় বেণীমাধবের পাণিগ্রহণ শ্রীমতী পঙ্কজাসুন্দরীর সঙ্গে হওয়ার সময় থেকে দীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত স্বামীকে পরম সহিষ্ণুতা, সেবা ও সন্তান প্রতিপালন দ্বারা নিরুদ্বিগ্ন রেখেছেন। আক্ষেপের বিষয় বেণীমাধবের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের সূচনার মাত্র কয়েক মাস আগে ২৭ মে, ১৯৮৮ সালে তাঁর স্ত্রীর প্রয়াণ ঘটে। সাংসারিক জীবনে তাঁদের সর্বমোট বারোজন সন্তান-সন্ততি ছিল। তন্মধ্যে নয়টি কন্যাসন্তান ও তিনটি পুত্রসন্তান। প্রত্যেকেই পরবর্তীতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভাস্বর হয়েছেন। প্রতিটি সন্তানই তাঁর পিতার সুনাম রেখে পরিবার তথা আপামর বৌদ্ধ সমাজের গর্ব হয়ে উঠেছেন।

শেষ অধ্যায়

জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে অধ্যাপক বড়ুয়া বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মঙ্গলচিন্তায় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। সুদূর চট্টগ্রামের এক ক্ষুদ্র বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি বিদগ্ধ পণ্ডিতরূপে ভারত, বাংলাদেশ ও বিদেশেও সমানভাবে পূজিত হন। এতদসত্ত্বেও চট্টগ্রামের স্বীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও উন্নতি বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৩০ সালে ধারাবাহিকভাবে Calcutta Review-তে প্রকাশিত Thoughts of Progress নামে প্রবন্ধটি বর্ধিতাকারে The Philosophy of Progress শীর্ষক গ্রন্থটি নোভেলটি পাবলিশার্স দ্বারা পুনঃপ্রকাশিত হয়। ক্ষুদ্র এই রচনাটি ১৯৮৪ সালের ২৩ মার্চ রাতে স্বহস্তে লেখেন। তিনি এটি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধিকে উৎসর্গ করেন। এটি ছিল তাঁর জীবনের শেষ রচনা। আত্মীয়-পরিজন পরিবৃত হয়ে সজ্ঞানে কলকাতায় তাঁর বাসভবনে মাত্র ৫৯ বছর ৩ মাস বয়সে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রোগাক্রান্ত ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে রাতের খাওয়া সেরে পড়াশোনা করে বিছানায় শুতে যান। অধিক রাতে সেই শয্যায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অন্তিম প্রয়াণে বৌদ্ধ সমাজ এবং দেশ ও দশের এক অপূরণীয় ক্ষতিসাধিত হয়।

জীবনখাতার প্রতি পাতায়

১৮৮৮: ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মহামুনি পাহাড়তলি গ্রামে জন্ম। পিতা কবিরাজ রাজচন্দ্র তালুকদার ও মাতা ধনেশ্বরী দেবী। বেণীমাধব চতুর্থ সন্তান।

১৯০২: এম.ই পরীক্ষা পাশ করে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি।

১৯০৬: এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৯০৮: এফ.এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ। শ্রীমতী পঙ্কজাসুন্দরীর সঙ্গে পরিণয়। স্কটিশ চার্চ কলেজে পালি বিষয়ে বিএ-তে ভর্তি।

১৯০৯: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সদস্যপদ লাভ।

১৯১১: বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বিএ উত্তীর্ণ। বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভার সাধারণ সম্পাদক পদ লাভ।

১৯১২: এম.এ পড়াকালীন ছুটির অবকাশে স্বগ্রামের মহামুনি অ্যাংলো পালি ইন্সটিটিউশনে অস্থায়ী প্রধানশিক্ষকের দায়িত্ব পালন। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা থেকে তাঁর 'লোকনীতি' প্রকাশ।

১৯১৩: পালিতে এম.এ উত্তীর্ণ। প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পূর্বেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগে আংশিক সময়ের অধ্যাপকরূপে যোগদান। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা থেকে 'মণিরত্নমালা' ও 'গৃহীবিনয়' গ্রন্থ প্রকাশিত এবং কৃপাশরণ অবৈতনিক প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শক মনোনীত।

১৯১৪: লন্ডনে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য ভারত সরকারের বৃত্তি লাভ। বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভার পক্ষ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও স্বর্ণপদক প্রদান। ২০ সেপ্টেম্বর গবেষক ছাত্ররূপে প্রথম বাঙালি বৌদ্ধরূপে বিলেত যাত্রা। বৌদ্ধধর্মসভা কর্তৃক তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ 'মহামতিপট্‌ঠান-সুওন্ত' প্রকাশ।

১৯১৭: ১৮ জুলাই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম এশীয়বাসী হিসেবে ডি.লিট উপাধি অর্জন। ২১ ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগে 'ইউনিভার্সিটি লেকচারার' পদে যোগদান। ৩ নভেম্বর বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা কর্তৃক সংবর্ধনা প্রদান। সভার সম্পাদকের দায়িত্বগ্রহণ। ৯ ডিসেম্বর শ্রমন পূর্ণানন্দ স্বামী ও তিনি যৌথভাবে 'গুণালংকার লাইব্রেরি'

ও ‘জগজ্জ্যোতি’ পত্রিকার পরিচালনা ও সম্পাদনা করেন। ১৯২১ অবধি এই দায়িত্বে তিনি ছিলেন।

১৯১৮: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে তাঁর গ্রন্থ 'A Prolegomena to a History of Buddhist Philosophy' গ্রন্থ প্রকাশিত।

১৯১৯: ‘বৌদ্ধ অনুসন্ধান সমিতি’ স্থাপন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপনা।

১৯২০: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'Ajivikas' প্রকাশিত ও পালি বিভাগের প্রধান নির্বাচিত।

১৯২১: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'A History Of Pre-Buddhistic Indian Philosophy' গ্রন্থ প্রকাশিত। সহকর্মী শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে যৌথভাবে রচিত Prakrit Dhammapada শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত। ১৯২১-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ‘রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল’ (বর্তমান The Asiatic Society)-এর সাধারণ সদস্য নির্বাচিত।

১৯২৩: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা হতে ‘বৌদ্ধপরিণয় পদ্ধতি’ গ্রন্থ প্রকাশিত।

১৯২৪: মায়ানমার যাত্রা। ১৮ অক্টোবর Burma and Burmese Life বিষয়ে ভাষণ প্রদান। পরবর্তীকালে Calcutta Review, 3rd Series Vol XIII, Oct-Dec 1924-এ প্রকাশিত।

১৯২৫: ১ জুন ‘ইউনিভার্সিটি প্রফেসর’ মর্যাদা লাভ।

১৯২৬: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'Ashoka Edicts in New

Light' গ্রন্থ ও গঙ্গানন্দ সিংহের সাথে যৌথ সম্পাদনায় 'Barhut Inscription' গ্রন্থ প্রকাশিত।

১৯২৭: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সংস্কৃত বিভাগে' সাম্মানিক লেকচারার নিযুক্ত। পুনরায় মায়ানমার ভ্রমণ। যেখানে রচিত 'Burma and Burmese Treasures' প্রবন্ধ Calcutta Review. Vol XXIII April-June 1927 সংখ্যায় প্রকাশিত।

১৯২৯: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'Old Brahmhi Inscriptions in the Udayagiri and Khandagiri Caves' প্রকাশিত।

১৯৩০: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পালি বিভাগের প্রফেসর পদ লাভ।

১৯৩১: Gaya and Buddha Gaya: Early History of the Holy Land (Vol-I) গ্রন্থ প্রকাশিত।

১৯৩৪: Gaya and Buddha Gaya: Old Shrines at Buddha Gaya (Vol-II) গ্রন্থ প্রকাশিত।

১৯৩৫: ১ জুলাই 'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর' সভার অধীনে 'নালন্দা ভবন' প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৬: ইন্ডিয়ান রিসার্চ ইন্সটিটিউট হতে 'বৌদ্ধ গ্রন্থাকোষ' (১ম খণ্ড) প্রকাশিত।

১৯৩৭: 'আর্য বিহার' নির্মাণে ভূমিকা গ্রহণ। মহাবোধি সোসাইটি হতে 'Religion of Ashoka' গ্রন্থ প্রকাশিত।

১৯৩৮: Bramhachari Kuladananda and His guru Bijay-Krishna Goswami: A Biography গ্রন্থ রচনা। চতুর্থবার বার্মা যাত্রা।

১৯৪০: যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড হতে 'মধ্যমণিকায়' গ্রন্থ প্রকাশিত। তিরুপতি (অন্ধ্রপ্রদেশ)-তে All India Oriental Conference-এর Prakrit বিভাগের সভাপতিত্ব।

১৯৪১: চট্টগ্রামে ধর্মরাজ, রামচন্দ্র ও সর্বানন্দের স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদান ও বক্তৃতা প্রদান।

১৯৪৩: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে Inscription of Ashoka (Part-I) প্রকাশিত। চট্টগ্রামে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে ত্রাণসামগ্রী বিতরণে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

১৯৪৪: মার্চে শ্রীলঙ্কার ডোনা অ্যালপাইন রত্ননায়কে ট্রাস্ট ও মিলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিস্ট ব্রাদারহুড-এর যুগ্ম আমন্ত্রণে সিংহল (শ্রীলঙ্কা) যাত্রা ও বক্তৃতা প্রদান। তথায় বিদ্যালংকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ত্রিপিটকাচার্য' উপাধিতে সম্মানিত। কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটির কার্যকরী কমিটির সভ্য মনোনয়ন।

১৯৪৫: ভারতী মহাবিদ্যালয় হতে 'Ceylon Lectures' ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'Inscriptions of Ashoka' (Part-II) প্রকাশিত। তামিলনাড়ুর আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক All India History Congress-এর Ancient Indian বিভাগে সভাপতিত্ব।

১৯৪৬: কলিকাতার New Age Publisher হতে তাঁর গ্রন্থ

Ashoka and His Incriptions প্রকাশিত। দিল্লিতে Indian Philosophical Congress-এ অংশগ্রহণ ও 'The Role of Buddhism in Indian Life and Thought' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন। ৫ মার্চ চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শাখা আয়োজিত বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে 'বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান' শীর্ষক সভাপতির অমূল্য ভাষণ প্রদান।

১৯৪৭: শ্রী প্রবোধ চন্দ্র সেন রচিত 'ধর্মবিজয়ী অশোক' গ্রন্থের প্রস্তাবনা ও শ্রী বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী অনূদিত 'অভিধর্মাকৃসঙ্গহো' গ্রন্থের মুখবন্ধ রচনা।

১৮৪৮: ১৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক 'ড. বিমলাচরণ লাহা' স্বর্ণপদক সম্মান লাভ ও সাধারণ ফেলো নির্বাচিত।

১৯৩০ সালে Calcutta Review-তে প্রকাশিত Thoughts on Progress নামে প্রবন্ধ বৃহৎ কলেবরে 'The Philosopy of Progress' গ্রন্থ নামে নোভেলটি পাবলিশার্স দ্বারা পুনঃপ্রকাশিত হয়। তিনি এটি উৎসর্গ করেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধিকে। ২৩ মার্চ লিখিত তাঁর উৎসর্গপত্র জীবনের শেষ রচনা। ২৩ মার্চ রাতে অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়ার মহাপ্রয়াণ ঘটে।

———————— ঃ ————————

কৃতজ্ঞতাস্বীকার:

শ্রী ইন্দ্রনীল বড়ুয়া
বার্তা সম্পাদক, 'ইউনাইটেড বৌদ্ধ দর্পণ' পত্রিকা। সহ-সম্পাদক, 'ইউনাইটেড বুদ্ধিস্ট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশান ও প্রাক্তন ছাত্র, পালি বিভাগ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
চলভাষ: ৮৬৯৭০০৬৬৮০
ই-মেল: baruaindra222@gmail.com

তথ্যঋণ

১। অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া : নন্দিত জীবন ও অনর্ঘ গবেষণাকর্ম— দীপক কুমার বড়ুয়া।
২। ইউনাইটেড বৌদ্ধ দর্পণ পত্রিকা, বিশেষ বেণীমাধব সংখ্যা (Vol.-II, Dec 5)।
৩। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস : ড. মণিকুন্তলা হালদার (দে)

Helpline

1800 120 2130

Visit Us at

http://www.wbmdfc.org/

WEST BENGAL MINORITIES' DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION

(A Statutory Corporation of Govt. of West Bengal)

"AMBER" DD-27/E, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-700064